Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 178 – 188
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অনীশদেবের গল্প : মানবিক মহত্ত্বের ব্রত উদযাপন

ড. দেবশক্তি দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ওমেন্স কলেজ, শিলং
ইমেইল : debsaktidutta@gmail.com

Keyword
বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, মানব সভ্যতা, মানব মহত্ত্ব, জয়গান, গল্পকার, অনীশ দেব।

Abstract
মানুষের জীবনের জয়যাত্রার পথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রধান ও প্রথম ভূমিকা পালন করেছে। একেবারে শুরুতে বুদ্ধিমান মানুষ বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে মানব কল্যাণের কাজে দীক্ষিত করেছিল। কিন্তু বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের তৃতীয় দশকের সময়বৃত্তে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শুভ সংকল্পে মিশেছে আশঙ্কা ও ত্রাস। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে যবে থেকে বাজার জাত করে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তখন থেকে বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য বদলাতে শুরু করে বিজ্ঞানের একটা দিক আজ মূলত শক্তি চর্চায় রূপান্ত্রিত হয়েছে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনকে বিভিন্ন কালের দার্শনিক, সাহিত্যিকরা বিভিন্ন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্প ধারায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সর্বস্ব সভ্যতাকে প্রত্যাখ্যানের বড় আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের একটি ধারায় দেখা গেছে প্রযুক্তির এই আগ্রাসনকে প্রতিহত করে একটি মানবিক অভিমুখ সাহিত্যিক আকল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে। প্রশ্ন উঠতে পারে এঁদের এই প্রত্যাখ্যান কি বিজ্ঞানচর্চা বিরোধী। গল্পকারদের পাঠকৃতি থেকে যে কথাটি বুঝতে চেয়েছি তা হল এনারা কেউই কোনো অর্থে বিজ্ঞান বিরোধিতা করছেন না, কোন সুস্থবোধ সম্পন্ন মানুষ তা চাইতেও পারে না। প্রকৃতপক্ষে এঁদের ক্ষোভ সুস্থ মানবিকতাকে হত্যাকারী বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অমানবিক শক্তির বিরুদ্ধে। অনীশ দেবের গল্পেও বিমানবায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রত্যাহবান হেনে মানব মহত্ত্বের ব্রত উদযাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

Discussion
বিবর্তনের সূক্ষ্ম নিয়মে পশুর স্তর থেকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হবার সাথে সাথে প্রতিকূল প্রকৃতির বুকে নিজেদের অস্তিত্ব সুস্থিত ও সুরক্ষিত করতে মানুষ নতুন জিজ্ঞাসায় ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে অবতীর্ণ হয়। সেক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানবসমাজের নতুন সম্পর্কের বন্ধনসূত্র হিসাবে কাজ করেছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি। মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিটি পর্ব জুড়ে ছিল মানুষের প্রকৌশল আয়ত্ত করার ইতিকথা। আর সেই প্রকৌশল ও ভাবধারাকে ভিত্তি

করে মানুষের যুক্তিবোধ ও নিরন্তর অভ্যাস ও ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিজ্ঞানের পথ চলা। আজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এত সাফল্য, এত প্রগতির মধ্যে দঁাড়িয়ে আজ নানান প্রশ্ন উঠছে বিজ্ঞান–প্রযুক্তি আমাদের যথার্থ ভাবে এগিয়ে দিচ্ছে তো? নাকি সভ্যতার চাকাকে দ্রুত ঘোরাতে গিয়ে সে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। আমরা জানি সমাজের সার্বিক মঙ্গল তথা প্রতিটি মানুষের স্বার্থ বিজ্ঞানের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের আন্তজাতিকতা, বিজ্ঞানীর নৈতিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা নানাপ্রকার সমস্যা ও সংঘাতে জড়িত। বিজ্ঞানের ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যায় বিজ্ঞান কোনদিনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিল না। বিজ্ঞানের ওপর পুঁজিবাদের শাসন ভিতরে ভিতরে প্রকট ছিল তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তার ফলে উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞান বিপথগামী হয়ে নৈরাশ্যবাদী হয়ে পড়েছিল। বিকৃত আদর্শ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে মানবিক-বিদ্যা্র ঐতিহ্য ও বৌদ্ধিকচর্চা থেকে উত্তরোত্তর বিচ্ছেদ ঘটাতে থাকে।

বিশ শতকের শুরুর দিকে সাম্রাজ্যবাদ প্রবলভাবে প্রসার লাভ করে। মুনাফা লাভের তাগিদে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি অন্যান্য দুর্বল দেশগুলির উপর উপনিবেশ বিস্তার করে অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে তৎপর হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের দর্শনকে বিকৃত করে, মানব কল্যাণকর চিন্তা-চর্চাকে বিসর্জন দিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি ও উগ্র জাতীয়তাবাদের নেশায় সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের কালো মেঘে মুড়ে ফেলে। সভ্য ও সমৃদ্ধ দেশের পাহাড় প্রমাণ পুঁজি বাধ্য করে দেশের বাইরে বৃহৎ বাজার অনুসন্ধান করতে। শুরু হয় সমগ্র বিশজুড়ে তাদের বাজার দখলের প্রতিযোগিতা। সেই সঙ্গে শুরু হয় অনুন্নত দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জৈবসম্পদ, এমনকি মানব-সম্পদ লুণ্ঠন করার লড়াই। যার ভয়ংকর পরিণাম দুদুটি মহাযুদ্ধের নারকীয় হত্যালীলা কলঙ্কিত করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে। আণবিক, রাসায়নিক,জীবাণু যুদ্ধ থেকে পারমাণবিক সন্ত্রাস এমনকি বর্তমানে জিন-যুদ্ধে সন্ত্রস্ত আজকের বিশ্ববাসী। তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় প্রহর গুনছে মানুষ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে যখন থেকে বাজারজাত করে পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তখন থেকেই বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য ক্রমশ বদলাতে বদলাতে বিজ্ঞানের আর একটি দিক আজ মূলত শক্তি চর্চায় রূপান্তরিত হয়ে শুভ সংকল্পের আনন্দময় ক্ষেত্র থেকে বহু যোজন দূরে সরে এসেছে।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসনকে বিভিন্ন কালের সাহিত্যিক, দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র জড়বাদী সভ্যতার অর্থ মগ্ন চেহারা দেখে কমলাকান্তকে দিয়ে বলিয়েছেন—

> "তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না, একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের যে মহলে বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা সেখানে আনন্দই পেয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্য মহল, যেখানে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেছে ব্যবহার শিল্পে, সেখানে যন্ত্রের প্রাধান্য, বিপুল যন্ত্রশক্তি দানবের রূপ ধারণ করে এক বিচ্ছিন্নতাবোধের জন্ম দিয়ে মানবিক সত্তাকে গ্রাস করে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে-এ দিকটি ঋষি-কবির পছন্দ হয়নি। তার প্রমাণ কবির বিভিন্ন রচনায় মেলে। রবীন্দ্রনাথ কালান্তর গ্রন্থে লিখেছেন—

> "বিজ্ঞান যেখানে সর্বসাধারণের দুঃখ এবং অভাব মোচনের কাজে লাগে, যেখানে তার দান দশজনের কাছে গিয়ে পৌঁছয় সেইখানেই বিজ্ঞানের মহত্ত্ব পূর্ণ হয়। কিন্তু যেখানে সে বিশেষ ব্যক্তি বা জাতিকে ধনী বা প্রবল করিয়া তুলিবার কাজে বিশেষ করিয়া নিযুক্ত হয়, সেখানেই তার ভয়ঙ্কর পতন। কারণ, ইহার প্রলোভন এত অত্যন্ত প্রকাণ্ডরূপে প্রবল যে আমাদের ধর্ম বুদ্ধি তার কাছে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নামের বর্ম পরিয়া নিজেরই শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহাতে আজ জগতের সর্বত্র এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির সম্বন্ধ দুর্বলের দিকে দলন বন্ধনের দ্বারা ভারগ্রস্ত এবং প্রবলের দিকে হিংস্রতার অন্তহীন প্রতিযোগিতায় উদ্ধত হইয়া উঠিতেছে, সকল দেশে যুদ্ধ ও যুদ্ধের উদযোগ নিত্য হইয়া উঠিতেছে এবং পোলিটিকাল মহামারীর বাহন যে রাষ্ট্রনীতি তাহা নিষ্ঠুরতা ও প্রবঞ্চনায় অন্তরে অন্তরে কলুষিত হইতে থাকিল।"[২]

বোঝা যায় বিজ্ঞানের যে দিকটি শুধুই কল্যাণ ও আনন্দের মন্ত্রে দীক্ষিত সেই দিকটিকে কবি সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন, তা না হলে কবি আশঙ্কা করেছিলেন যে মনুষ্যত্ব হীনবল হয়ে পড়বে। কিন্তু knowledge is power এই

আপ্তবাক্যকে প্রয়োগবিজ্ঞানের পুরোভাগে জুড়ে দিয়ে মানুষকে যখন যন্ত্রের দাস বানায় মানবিকসত্তাকে নিপীড়িত করে- সেই দিকটির প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করেছেন কবি। যখন মানুষের মানবিকতা, স্বাভাবিকতা বিপন্ন ও পীড়িত তখন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের সমাজের প্রতি, জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতেই হয় বীভৎস মহতী বিনষ্টিকে প্রতিহত করে মানবিক মহত্ত্বের ব্রত উদযাপনে। নূরুল কবিরকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে হাসান আজিজুল হক জানিয়েছেন—

> "যে অসম্ভব উৎকট পৃথিবীতে আজ আমরা বাস করছি তা তো মানুষই তৈরি করেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী গ্রহটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার অস্ত্র নির্মাণ করেছে মানুষ, পৃথিবীর দূরতর প্রান্তে বসবাস করছে যে নিরীহ মানুষটি তার সমস্ত রক্তটা চুষে নেওয়ার চোঙ তৈরি করেছে মানুষ, মানুষকে চাপা দিয়ে থেতো করে দেবার যন্ত্র বানাতে পেরেছে মানুষ। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মানব পরিস্থিতি আজ এক অসম্ভব অসহনীয় পরিস্থিতি। লেখকের দায় তাই বড়ো অর্থে মানবজাতির কাছে— সুনির্দিষ্ট অর্থে আপন দেশ ও কালের কাছে। বিকারগ্রস্ত মানব অস্তিত্বকে ঠিক জায়গায় আনার যে কর্মযজ্ঞ তাতে অংশ নেওয়াই লেখকের কাজ।"[৩]

উনিশশো সত্তর পরবর্তী বাংলা ছোটোগল্পের নান্দনিক প্রতিবেদনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বগ্রাসী আগ্রাসনকে প্রতিহত করে মানব-মহত্ত্বের ব্রত উদযাপনের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে বাংলা কল্পবিজ্ঞানের গল্পকারেরাও এই নান্দনিক যুদ্ধে সামিল হয়েছেন মানবতার সংকট মুহূর্তে বিপন্নতার বিপ্রতীপে মানবিক মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প বা সায়েন্স ফিকশনের সংজ্ঞা বা সমীকরণ নির্মাণে বলা যায় বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বের উপর ভর করে কল্পনার মিশেল দিয়ে এইপ্রকার গল্পের কাহিনি নির্মিত হয়। অনেকে এই ধরণের গল্পকে আধুনিক রূপকথা বলেও আখ্যায়িত করেছেন। গল্পকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত '২৫টি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে লিখেছেন- "সেকেলে রূপকথার দিন আর নেই। তার কারণ পৃথিবীতে আর অজানা দেশ নেই। এ যুগের বাচ্চারা আর সেই সব রূপকথাকে তেমন উপভোগ করে না। আর রূপকথা যখন খোলনলচে পাল্টে, বিজ্ঞানের পোশাক পরে এসে হাজির হয় তখন আবার তার আকর্ষণ দুর্নিবার হয়ে ওঠে।" কল্পবিজ্ঞানের পরিধি আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অদূর ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রা করে কৌতূহলকে প্রসারিত করে রাখে। যা বর্তমানে অলীক কল্পনা বলে মনে হয়, ভবিষ্যতে সেই বিজ্ঞান-নির্ভর কল্পনা বাস্তবের সত্যতায় পরিণত হতেই পারে এমন নতুন দিনের কথা, জীবনের কথা আশাও করা যায়। তাই শুধু শিশু বা বালক কিশোররাই নয়, সব বয়সের পাঠকদের আবিষ্ট করে রাখে এই প্রকার গল্প।

বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞানের লেখক সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা বলা যায়। অনীশ দেব ছিলেন কল্পবিজ্ঞানের সিদ্ধহস্ত জনপ্রিয় লেখক। ১৯৫১ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। উচ্চশিক্ষায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স এবং ফলিত পদার্থবিদ্যায় বি টেক, এম টেক ও পি এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত পদার্থ বিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনায় রত ছিলেন দীর্ঘসময়। স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সহজাত। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক টানাপোড়েন, অনন্ত মহাকাশের বিস্ময়কর রহস্য, রোবট বা যন্ত্রমানব, ভিনগ্রহের জীব থেকে মর্ত্যলোক, পাতাললোক সবকিছু মিলিয়ে আগামী দিনের পৃথিবীর অচেনা ছবিতে সাজানো তাঁর গল্পভুবন। সেই সঙ্গে গল্পের পরতে পরতে তাঁর মানবতাবাদী জীবনদর্শন ক্রোশে দিয়ে বোনা। অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন তাহলে কি বিজ্ঞান বিরোধীতা এই ধারার গল্পগুলোর আসল উদ্দেশ্য, তা কিন্তু নয়। এনারা কেউই বিজ্ঞান বিরোধীও নন, প্রাগ্রসর সভ্যতাকে উজিয়ে যাওয়ার কথাও বলছেন না, পরিবর্তে চেয়েছেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আগ্রাসনকে প্রতিহত করে একটি মানবিক অভিমুখ সাহিত্যিক আকল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে।

সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মাধ্যমে পুঁজির বাজার বৃহৎ করতে উৎপাদন বাড়ানো ও বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় মেতেছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলি। তাদের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম বণ্টনের পরিবর্তে দরিদ্র দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ্ জৈবসম্পদকে কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি। প্রকৃতির খুশি মনে সাজিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য ও প্রাণের সহজ ধারাতে মানুষ আজ সন্তুষ্ট নয়। তার অপরিমিত

লোভ তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়ায়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে ধরিত্রী মায়ের গর্ভ চিরে জোর করে মরাধন তথা খনিজদ্রব্য দখল করার নেশায় মেতে উঠেছে শক্তিশালী দেশগুলি। ফলে পরিবেশ–প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের বুনন প্রতিনিয়ত বিপন্ন হতে বসেছে। তাতেই পৃথিবী'র সঙ্কাটাপন্ন অবস্থা। এত যুদ্ধ রক্তক্ষয়, প্রাণহানিতেও আমাদের সুচেতনার উন্মেষ ঘটেনি। অনীশ দেবের 'বুকের ভেতরে' নামক গল্পের কথনবিশ্বে দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় মেতে ওঠা সমগ্র বিশ্ব আজ সন্ত্রস্ত। নগর পুড়িলে দেবালয় যেমন সেই আগুনের হাত থেকে রেহাই পায় না, ঠিক তেমনি যুদ্ধের আঁচ শুধু দুর্বল দেশগুলিকেই নয়, সেই সঙ্গে উন্নত দেশকেও স্পর্শ করবে যার পরিণতি ভয়াবহ। সময়ের সাথে সাথে রণকৌশল ও সমরাস্ত্রের সরঞ্জাম বদলেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিভীষিকা। এই পরমাণু অস্ত্র নিয়ে সকলেই যদি একে অপরের দিকে আক্রমণ শুরু করে তাহলে এই গ্রহ থেকে মানবজাতির অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই মানবসভ্যতার ইতিহাসের যাতে এমন সর্বনাশা সংকট না আসে সেই প্রচেষ্টায় কিছু মানবতাবাদী, সহৃদয় ব্যক্তি জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করে বহু পরিশ্রম ও মেধা দিয়ে মাটির নীচে অসংখ্য সুরঙ্গ নির্মাণ করে আর এক জগৎ তৈরি করেছেন, যেখানে যুদ্ধের আঁচ স্পর্শ করবে না। সেই সুরক্ষিত সুরঙ্গের মধ্যে সুস্থ সবল পঞ্চাশটি পুরুষ শিশু ও পঞ্চাশটি নারী শিশুদের রাখা হয়েছে। তাদের দেখাশোনার জন্য দশ জন শিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের নিযুক্ত রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে মজুত রেখেছেন দীর্ঘ কুড়িবছরের জন্য তাদের ঘন খাবার, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার ওষুধপত্র, তাদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বইখাতা ও গবেষণাগার। সেই সুচেতনা সম্পন্ন মানুষগুলির এই প্রকার কর্মকাণ্ডের মহতী উদ্দেশ্য হল-

> "কোনও মহাপ্রলয়ে পৃথিবী'র সমস্ত মানবসভ্যতা শেষ হয়ে গেলেও মাটির নীচে লুকানো ওই শিশুরা নতুন করে একদিন গড়ে তুলবে নতুন মানবসভ্যতা। স্তব্ধ কলকারখানাকে ওরা আবার সচল করে তুলবে। আবার সবুজে- সবুজে ভরিয়ে দেবে চারদিক।"[৪]

এই পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার মহান ব্রতে ব্রতী যে সমস্ত ব্যাক্তি আত্মনিবেদিতপ্রাণ তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গল্পের কথক রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরী, তার প্রেমিকা সুমিতা এবং সিকিওরিটি কণ্ট্রোলের চিফ ব্রিগেডিয়ার রাজামানি। কিন্তু তাদের এই মহান উদ্দেশ্যকে বিফল করতে উদ্যত প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক শত্রু গোষ্ঠী যাদের প্রতিনিধি তিরি, সল ও ইকা। এরা তিনজনই সমান হিংস্র, সমান নিষ্ঠুর। উদ্দেশ্য তাদের-

> "এক অদ্ভুত রাসায়নিক নিষ্কাশন পদ্ধতি নাকি বের করেছে। এই পদ্ধতির সাহায্যে অত্যন্ত কম খরচে ওরা পৃথিবীর মাটি থেকে বের করে নিতে পারছে সিলিকন, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ, ক্যালসিয়াম আরো কত কী? গাছের পাতা থেকে ওরা বের করে নিচ্ছে হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন আর পশুপাখির হাড় থেকে পেয়ে যাচ্ছে ক্যালসিয়াম।"[৫]

এমনকি মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে তাদের হাড় থেকে ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করছে। এইসব পদার্থ দিয়ে ওরা আধুনিক উন্নত-প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্পের পত্তন করবে। তাদের এই উন্নয়নের কাজ শুরু হবে মানবসভ্যতাকে পুরোপুরি ধবংস করে। তাই ওই গোপন টানেলের ম্যাপ ও শিশুদের খোঁজে তারা সিকিওরিটি কন্ট্রোলরুম আক্রমণ করে চিপ ব্রিগেডিয়ার রাজামানি সহ রুদ্রপ্রসাদ চৌধুরীর অন্যান্য সহকর্মীদের মেরে ফেলে। এবার তাদের নজরে রুদ্রপ্রসাদ। শত অত্যাচারে চড়-থাপ্পড়, ইস্পাতে মোড়া বুলেট গুঁতো, ঈগলের মতো তীক্ষণ ধারালো নখ দিয়ে গাল চিরে রক্ত ঝড়ানো, আবার ভুরুর নীচে ছুরির ফলাটা চেপে ধরে যন্ত্রণা দেওয়া। শুধু এটুকু নয়, নিজেকেও ওদের কাছে রোবট বলে পরিচয় দেওয়াতে তারা শুরু করে সন্দেহ নিরসনের অপারেশন –

> "বুকের বাঁ দিকে ছুরিটা বসিয়ে দিল, তিরি। ব্যাটারি খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। ছুরির আঘাতে ছিন্ন হচ্ছে স্নায়ু ধমনী শিরা।"[৬]

জান্তব গর্জনে রুদ্রপ্রসাদের বুকের ভেতরে খোঁড়াখুড়ি চালানোর অসহ্য যন্ত্রণা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছেন তিনি। শত্রুপক্ষের অসৎ উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। রুদ্রপ্রসাদের বুকের অতলে গভীর থেকে তারা ভবিষ্যতের মানবসভ্যতার ঠিকানা খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়নি। আসলে আমরা জানি– 'মানুষের মৃত্যু হলে তবু মানব বেঁচে থাকে'। রুদ্রপ্রসাদের এ দায়বদ্ধতা শুদ্ধাশীলসত্তা দিয়ে গড়া এক পরম প্রত্যয়। আর তাতেই যন্ত্রসভ্যতার শয়তানি নয়,

মানুষের দেহাতীত মহাপ্রাণ মানবতার শাশ্বত কল্যাণী রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থের প্রলয়ের সৃষ্টি প্রবন্ধে বলেছেন-

> ''যারা দস্যুবৃত্তি করেছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসের তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয় বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না, তা হলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড়ো বড়ো কামনা মরেনি। কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণার দাস নয় সে, এখনো মানুষ চলছে, এখনো তার মহত্বের উৎস শুকোয়নি। মানুষের ইতিহাসের অন্তরে যদি মহতের কোনো স্থান না থাকত তবে মানুষের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকত না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যএর মধ্যে এইই মানুষের আশ্বাসবাণী। সমস্ত সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে— সমস্ত দুঃখের মধ্যে সমস্ত পাপের মধ্যে পুণ্যের আবির্ভাব এই আমাদের আশা।''[৭]

-জয় জয় জয় রে মানব–অভ্যুদয় / মন্দ্রি উঠিল আকাশে।

তাঁর সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র'-র অন্তর্গত চরম অস্ত্র শীর্ষক গল্পে দেখা গেছে বিজ্ঞানের দুঃশাসন-মূর্তির প্রতি অভিনব প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে রাজ্যের পর রাজ্যে সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর পরিবেশ তৈরি করে চলেছে। এবার তাদের লক্ষ্য ইরাক। তাই প্রেসিডেন্টের স্পষ্ট আদেশ তাদের দেশের বিজ্ঞানীদের উপর—

> ''নিত্যনতুন মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করুন। ফ্যাক্টরিতে চব্বিশঘণ্টা কাজ চলবে। চব্বিশ ঘণ্টা মানে চোদ্দশো চল্লিশ মিনিট— তার একমিনিটও কম নয়।''[৮]

মার্কিন প্রেসিডেন্টের আদেশ মতো অস্ত্রবিভাগের প্রধান টমাস ফাউটেন চেয়েছিলেন ইরাকের মাটিতে হিরোশিমা নাগাসাকির ধবংসাত্মক লীলার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অতিসত্বর যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাতে। বিকৃত মনের সর্বনাশা অভিপ্রায়ে তাই চাপ আসে আর্মস ফ্যাক্টরির চিফ ইঞ্জিনিয়ার জোসেফ আইনস্টাইনের উপর ভয়ঙ্কর কিছু মারণাস্ত্র বানানোর। বিশ্বের দরবারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্য জাহির করতেই দেশের প্রেসিডেন্ট সহ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কর্তা–ব্যক্তি-আমলারা জোসেফ আইনস্টাইনের আবিষ্কারের দিকে আশা করে আছেন কারণ জোসেফ অভিনব যুদ্ধাস্ত্র বানানোয় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত নতুন ধরণের ক্ষেপনাস্ত্র সহ দু-দুটো যুদ্ধবিমানকে বিরোধীপক্ষ অনায়াসে অকেজো করে ফেলায় তাদের অহংবোধে আঘাত লাগে। তাই ধবংসাত্মক কিছু মারণাস্ত্র বানানোর চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে জোসেফ আইনস্টাইনের উপর। কিন্তু প্রতিটি যুদ্ধের জীবন বিনাশী খেলার বিভৎসতায় বিজ্ঞানী জোসেফের বিবেকী-চৈতন্য আর জীবন নাশে সায় দেয়নি। সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে সুন্দর সুস্থ্য ভবিষ্যৎ রক্ষার্থে শান্তিপূর্ণ এক পৃথিবী গড়ার শুভ সংকল্প গ্রহণ করেন। তাই এবার ওয়ার স্টপার' নামে এক চরম অস্ত্র হেনে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। স্পেস প্লেনে করে ওয়ার স্টপার যুদ্ধ ঘাঁটিতে পৌঁছালে কম্পুটারের সাহায্যে বসরা বন্দর শহর লক্ষ করে ক্ষেপনাস্ত্রটি ছুড়ে দেওয়া হলে, ইরাকি যুদ্ধবিদরা শত চেষ্টা করেও সেটিকে অকেজো করতে পারে না—'বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে হতবাক হয়ে গেল সকলে। কোথায় চোখ ধাঁধানো আগুন? কোথায় বিষাক্ত ধোঁয়া? তার বদলে চোখে পড়ল তুষার-কুচির মতো অসংখ্য সাদা ফুটকি ভোরের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ও গুলো ক্রমশই চেনা গেলো হাজার হাজার সাদা পায়রা পাগলের মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। সদ্য উঁকি দেওয়া সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ওদের ডানার পালক থেকে। রাস্তায় লক্ষ লক্ষ মানুষ এই অদ্ভুৎ দৃশ্য দেখার জন্য জড়ো হয়ে গেল। পায়রাগুলো আরও নীচে নেমে আসতেই ওদের কারও কারও ঠোঁটে ধরা পলিমার দিয়ে তৈরি ইংরেজি হরফগুলো সকলের চোখে পড়ল। উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক নিজেদের সাজিয়ে নিতেই পাঁচ অক্ষরের শব্দটা সকলে পড়তে পারল; PEACE''[৯] বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পক্ষে লেখক জোসেফ আইনস্টাইনকে একজন অগ্রণী সৈনিক হিসাবে গড়ে বিশ্বের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। লক্ষণীয় গল্পের শেষ লাইনটি— ''পায়রার ঝাঁক তখনও আনন্দে উড়ছে— উড়ছে—'' পায়রা যেহেতু শান্তির প্রতীক, সেহেতু সমগ্র বিশ্বে অনন্ত শান্তির আনন্দ ধারা নিরন্তর বহমান রাখতেই এমন বাক্য শৈলীকে আশ্রয় করেছেন লেখক। পাটভাঙা শাড়ির মতো অনীশ দেবের গল্পের ভাঁজে ভাঁজে মানবিক দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি নক্সার মতো লেগে আছে। আজকের

প্রযুক্তি সর্বস্ব মানব সভ্যতায় যন্ত্রের দাসত্ব স্বীকার করতে গিয়েই শুকিয়ে মরতে বসেছে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তি—দয়া মায়া প্রেম প্রীতি ভালোবাসা আবেগ অনুভূতি— তথা মানবিক সত্তা। মানুষে মানুষে সম্পর্কহীন পারক্যবোধ থেকে সামাজিক মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিতে পরিণত হচ্ছে নিষ্ঠুরভাবে। বিশ্ব জগৎকে মানুষ জানছে একটি যান্ত্রিক নিয়মের মধ্য দিয়ে, যেখানে হৃদয় বলে কিছু নেই, শুধু প্রয়োজন ও নিয়মের সম্পর্কে। আসলে মানুষ নিজেই যখন মানবিক নির্যাস বিহীন যন্ত্র- দানবে পরিণত হয় তার পরিণাম আরো ভয়াবহ হয়। ভোলাকে ভোলা যাবে না কিছুতেই' গল্পের আপা্তসরল, নিছক বালকপাঠ্য কাহিনির মধ্যে দেখা যায় খুব ছোটোবেলায় গল্পের কথক বালকটি অর্থাৎ সন্তুর দেখাশুনার জন্য এশিয়া রোবোটিক্স কোম্পানি থেকে ভোলা নামে ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট হিসাবে যন্ত্র দাসকে বাড়ি নিয়ে নিয়ে আসে তার বাবা। ভোলা যে যন্ত্রদাস বা রোবট তা আপাতভাবে বোঝা না গেলেও তার চলাফেরা ও কথাবার্তায় আঁচ করা যেত। গৃহস্থের উপযুক্ত সঙ্গী রোবট ভোলা সমস্ত কাজ নিপুণ দক্ষতায় মন দিয়ে ক্রতো—

> "আমার স্কুলে যাওয়ার সময় হলেই ভোলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোত। বড়ো রাস্তা পার করে বাস ধরে আমাকে পৌঁছে দিত স্কুলে। তারপর সারাক্ষণ স্কুলের বাইরে একটা গাড়িবারান্দার নীচে বসে অপেক্ষা করত।"[১০]

স্কুল শেষে সন্তুকে নিরাপদে বাড়ি ফিরিয়ে আনা, পরীক্ষার সময় পরিবারের আর পাঁচটা সহৃদয় সদস্যদের মতো মাথায় স্নেহের স্পর্শ দিয়ে পরামর্শ দানও করতো। শুধু তাই নয়, ঘরের সমস্ত সাংসারিক কাজকর্মে সিদ্ধহস্ত। সন্তুর বাবার বিভিন্ন ফাইফরমাশ–দোকান যাওয়া, টেলিফোনের বিল জমা করা, ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়ার সমস্ত কাজ ভোলা একা হাতে সামলাতো। তবুও কোনোদিন ভোলার চেহারায় ক্লান্তির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নজরে পড়তো না। ভোলার কর্মদক্ষতার প্রশংসার বাণী কর্তার মুখেও শোনা গেছে –

> "একটা ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবটের কাছ থেকে এতো সার্ভিস পাব ভাবিনি।"[১১]

এমনকি ভোলা সিনেমা দেখে নিজের ভালো লাগার অনুভূতি প্রকাশ পর্যন্ত করতে পারে। তার বুদ্ধিমত্তা ও গৃহস্থের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধও কম নয়। বিপদের সময় শত্রুপক্ষের মোকাবিলায় সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ঋণপাশে আবদ্ধ করেছে পরিবারটিকে। কিন্তু এতদসত্বেও ভোলার কাছ থেকে কর্তা অর্থাৎ সন্তুর বাবার চাহিদা অনেক। গল্পকার কৌশলে দেখাতে চেয়েছেন যন্ত্রসভ্যতার কারণে মানবিক সত্তা সং্কটের রূপটি। আসলে গৃহকর্তা নিজেই যন্ত্রের দাসত্ব করতে করতে অজান্তে যন্ত্রমানব ভোলাকেও ছাপিয়ে গেছে। তার মানবিক সংবেদনশীল সৌন্দর্যবোধ আস্তে আস্তে কুৎসিত কদর্যতায় পরিণত হয়েছে। স্থূল যান্ত্রিকতা মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে মানুষকে পশু করে তোলে। সন্তুর বাবা রোবট ভোলাকে সমস্ত প্রকার কাজে পারদর্শী হিসাবে দেখতে চেয়েছিল। ভোলা যেহেতু কম্পুটারের অনভিজ্ঞ আধুনিক যুগের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না তাই তার ইচ্ছা— 'এশিয়া রোবোটিক কোম্পানী একটা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যানাউন্স করেছে। ভি, এক্স-থ্রি মডেলের রোবট আর ত্রিশ হাজার টাকা দিলে ওদের লে্টেস্ট কম্পুটার কম্প্যাটিবল ডোমেস্টিক কম্প্যানিয়ান রোবট দেবে। মডেলটার নাম ভি, এক্স, আ কিউ-ওয়ান।"[১২] আজকের যুগে যন্ত্রের মানবায়ন কল্পনা করা গেলেও মানুষের যন্ত্রপীড়িত সত্তা তাকে যান্ত্রিক ত্রুটি হিসাবে দেখে। তাই লেখক ভোলার মুখে যে কথাগুলো জুগিয়েছেন–

> "আমি যে এত বছর তোমাদের কাছে রইলাম, তোমাকে, ভাইটিকে এত যত্ন করলাম, তার কোনো দাম নেই। তুমি বলছ বাজারে এখন অনেক ভালো মডেলের রোবট পাওয়া যাচ্ছে— তাই আমাকে বদলে ফেলতে চাও। তাহলে একটা পাল্টা উদাহরণ তোমাকে দিই— শুনতে হয়তো তোমার খারাপ লাগবে। -ভাইটির বয়সের অনেক ছেলেকে আমি দেখি তারা ভাইটির চেয়ে দেখতে ভালো, লেখাপড়ায় ভালো, অনেক গুণ আছে— মানে, অনেক ভালো মডেলের ছেলে। তাহলে তুমি কি চাইবে, ভাইটিকে বদলে আর একটা ভালো মডেলের ছেলে নিয়ে আসতে? সম্পর্কের কোনো দাম নেই তোমার কাছে।"[১৩]

কিংবা—

> "তুমি বলছ আমি অনেক কাজ পারি না। ঠিক কথা। কিন্তু অন্য অনেক কাজ তো পারি। তুমিও তো অনেক কাজ পারো না, বাবা এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম, কেউ সব কাজ পারে না। তাতে লজ্জার কিছু নেই।"[১৪]

তা যন্ত্র-লাঞ্ছিত মানুষের ভিতরকার মানবিক বোধের উত্তাপকে জাগিয়ে তুলতে। যন্ত্রের বিপ্রতীপে নিরন্তর প্রাণের মহিমা সচল রাখতে। তাই গল্প শেষ হয় মানুষ হবার সংকল্পে –

> "আমি মানুষের চেয়ে একটুখানি কম। সেইজন্যেই আমি সারাটা জীবন ধরে মানুষ হওয়ার চেষ্টা করে চলেছি।"[১৫]

'সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত 'বুদ্ধি যদি বৃদ্ধি পায়' গল্পে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দুঃশাসন মূর্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে মানবিক প্রত্যয়ে আস্থা রাখার অভিকর্ষ নির্মিত হয়েছে। গল্পের কাহিনিতে দেখা গেছে সোমা ও পুরন্দর দম্পতির মেয়ে ঝুনু ও ছেলে বিকুনকে নিয়ে তাদের ছোট্ট সুখী পরিবার। মেয়ে বেশ মেধাবী। মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্টার সমেত পাঁচটি বিষয়ে লেটার নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে উচ্চমাধ্যমিকেও আশানুরূপ ভালো রেজাল্ট করে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে। কিন্তু এই দম্পতির দুশ্চিন্তা তাদের পুত্র বিকুনকে নিয়ে। পড়াশুনার চেয়ে তার—

> "অনেক বেশি ভালো লাগে গাছপালা, পাখি আর প্রজাপতি দেখতে। সেগুলো দেখে ও যেসব রঙিন ছবি আঁকে তা দেখে বড়দের তাক লেগে যায়। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তি করতেও বেশ লাগে ওর।"[১৬]

এমনকি ফাংশানে আবৃত্তি করে প্রশংসাও পেয়েছে অনেকবার। কিন্তু অঙ্ক ও বিজ্ঞানে তার দুর্বলতা মা-বাবা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। এ কারণে নিত্যদিন বিকুনের কপালে জুটত বকাবকি, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যা তার মনের গভীরে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করত। বুদ্ধির দৌড়ে দিদির তুলনায় পিছিয়ে থাকার কারণে আক্ষেপও তার কম ছিল না। আসলে আজকের ক্যারিয়ারমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় সকলেই যেখানে সর্ববিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানে পৌঁছাতে চাইছে, সেখানে তাদের ছেলে সকলের চেয়ে পিছিয়ে থেকে ছবি আঁকবে, কবিতা আবৃত্তি করবে তা কি হতে পারে? এমন সংকটেপরা পিতা পুরন্দরের নজরে পড়ে খবরের কাগজে 'বুদ্ধি বিকাশ কেন্দ্রের' অভিনব বিজ্ঞাপন, যেখানে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের আই কিউ/বুদ্ধি বাড়ানো হয় মাত্র আধঘন্টায়। কালবিলম্ব না করে ঐদিনেই বিকুনকে নিয়ে তারা বুদ্ধি বৃদ্ধির অভিযানে রওনা দেয়। ডক্টর বর্ধনের চেম্বারে নানান যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর বিকুনের আই কিউ লেবেল কম থাকার আই কিউ বাড়ানোর উপায় জানতে চাইতে ডক্টর বর্ধন যা বলেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক–

> "বুঝেশুনে ধাপে ধাপে বাড়াতে হবে – যাতে ও বুদ্ধিবৃদ্ধির চাপটা সইতে পারে। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওটা আমার ব্যাপার। আজ আমি কয়েকটা স্পেশাল ডোজ দিয়ে ওর বুদ্ধি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। ওর ব্রেনের, মানে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের প্যারিটাল লোব আর ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি প্যারিটাল লোব থেকেই জন্ম নেয়। আর ফ্রন্টাল লোবের কাজ হল যুক্তি প্রয়োগ আর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সাহায্য করা। এই দুটো লোবকে একটু চাঙ্গা করে দিলেই শুভঙ্করের (বিকুনের পোশাকী নাম) বুদ্ধি বেড়ে যাবে। তবে এই বুদ্ধির এফেক্ট মাত্র তিনদিন মানে ৭২ ঘণ্টা থাকবে। যদি ব্যাপারটা ঠিক মতো শুভঙ্করের সুট করে যায় তাহলে আর কোন ও প্রবলেম নেই— তিন দিন পর ওকে নিয়ে আসবেন, ওই বর্ধিত বুদ্ধিটা একেবারে পারমানেন্ট করে দেব। মানে, কংক্রিট ঢালাই যাকে বলে-"[১৭]

বাড়ি ফেরার পথে শুরু হয় বর্ধিত বুদ্ধির এফেক্ট। কোইফিশেন্ট অব কাইনেটিক ফ্রিকশন থেকে শুরু করে পথে গতিবেগ, ত্বরণ, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের শতকরা হিসাবের গড়মিল, বুলবুলি পাখিদের জোড়ায় জোড়ায় থাকার কারণ, পিঁপড়েদের সারিবদ্ধ ভাবে চলার কারণ ইত্যাদি প্রশ্নে ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পুরন্দর ও সোমাকে কাহিল করে ছাড়ে বিকুন। বাড়ি ফিরে সেই মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। বিকুনের মনের মুক্তির আনন্দনিকেতন- ছবি আঁকা, কবিতা আবৃত্তি শিকেয় তুলে শুধুই মগজের চর্চা শুরু করেছিল। এতদিন যে অঙ্ক দুর্বোদ্ধ ছিল, এবার সে সব অঙ্ক মুখে মুখেই সহজেই সমাধান করে ফেলে। তিনরকম ডিকশনারির অর্থ, ভি ডি ও ট্রানজিসটর রেডিওর ডপলার এফেক্ট চোখের রেটিনার রডকোষ ও কোনকোষের ব্যাখ্যা, পাখার আর পি এম এমনকি মায়ের রান্নাঘরে ঢুকে বিভিন্ন খাবারের ক্যালরি, মেটাবলিজম, গ্যাসের দহন, পরিবেশ দূষণ নুন চিনি হলুদের মধ্যে থাকা রাসায়নিক উপাদান নিয়ে নানান প্রশ্নে অস্থির করে তোলে। তার

এই প্রশ্নবাণে ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগর্ভ তাত্ত্বিক কথাবার্তায় পরিবার পরিজন ছাড়াও গৃহশিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক সকলেই বিকুনের মানসিক সুস্থতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে থাকেন। স্কুলের হেডমাস্টার ফোন করে বলেন—

> "আপনার ছেলের মাথায় বোধহয় সামান্য প্রবলেম হয়েছে। সেটা সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওকে যেন স্কুলে পাঠাবেন না। মাস্টারমশাইরা কেন জানি না খুব ভয় পেয়ে গেছেন।"[১৮]

বিকুনের বন্ধুরাও তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এমনকি তার বাবা পুরন্দর আশেপাশে বিকুনকে দেখতে পেলেই হয়তো বাথরুমে ঢুকে ছিটকিনি দেয়, নয়তো রাস্তায় স্টকে পড়ে। মা সোমা কাজের অছিলায় সারাক্ষণ এঘর ওঘর ছুটোছুটি করে বেড়ায়। প্রাণঘাতী যন্ত্র-প্রযুক্তির চাপে বিকুনের মানবিক সত্তা নিপীড়িত হয়ে বিকুন উদ্ভট বালকে পরিণত হয়ে স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। যন্ত্র মানুষের সংজ্ঞাটাই বদলে দিতে চেয়েছিল। তাই নৈব্যক্তিক যান্ত্রিক মর্মদাহী সমস্যায় পরাজিত বিকুনের মায়ের মুখে শোনা গেছে আত্মদীর্ণ হাহাকার— "এ কী সর্বনাশ হল আমাদের।"[১৯] গল্পের শেষে দেখা গেছে লেখক যন্ত্র-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম তথা মানব মহত্ত্বকে মহিমান্বিত করেছেন। যন্ত্রের কার্যক্ষমতার রেশ ৭২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে বিকুন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলে সোমা ছেলেকে জাপটে ধরে আনন্দাশ্রু মেশানো গলায় বলে উঠেছে -

> "বুঝলে, আমাদের বোকাসোকা সুন্দর ছেলেটাই অনেক ভাল। ওর মুখটা কী মিস্টি। কী সুন্দর ছবি আঁকতে পারে ও। আর আবৃত্তিতে তো একেবারে চ্যাম্পিয়ান। আমার আর বুদ্ধিমান ছেলের দরকার নেই গো।"[২০]

প্রাণের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই সত্য ও সুন্দর। তার বিরুদ্ধে গেলে সুন্দরের পরিবর্তে কুৎসিত ও ভয়ানকের আবাহন করা হয়। বর্তমান সময়ে যন্ত্রসর্বস্ব ভোগবাদী সংস্কৃতির কুহকে আচ্ছন্ন আপামর মানুষ। সকলেই সাধ্যাতীত 'লক্ষ্যহীন লক্ষ বাসনা'র পিছনে উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। ভোগবিলাসের আবিলতায় তলিয়ে গিয়ে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় ও বিমানবায়নের অপর নাম হয়েছে সভ্যতা। ফলে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে অদ্ভুৎ আঁধার। অনাবশ্যক বস্তুভারে পীড়িত জীবনযাত্রায় সত্য-সুন্দরের সাধনা থেকে মানবমন বিচ্যুত। মূল্যহীন হয়ে পড়ছে চিরায়ত সম্পর্কের বন্ধন। মানুষে মানুষে হৃদয়ের সম্পর্কে আজ নিঃস্ব হতে বসেছে। তার জায়গা দখল করেছে প্রয়োজন ও নিয়ম রক্ষার সম্পর্ক, যা পুরোপুরি যান্ত্রিক ও কৃত্রিম। আধুনিক কলকব্জায় গড়া সভ্যতা আসলে মানব-মনীষাজাত নয়। এই জড়বাদী সভ্যতায় মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে তা সে নিজেই জানে না। তাই যন্ত্রজর্জর জীবনবৃত্তে মানবাত্মার কান্না প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। 'জীবনের চাবিকাটি' গল্পের কথক চরিত্রটির ছকেবাঁধা জীবনে দৈনন্দিন কাজের যাঁতাকলে পিষতে পিষতে ক্লান্তি ও অবসাদে মুহ্যমান। নিজেকে তার আখের ছিবড়ের মতো ঝেটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট বলে মনে হত। ক্লিষ্ট জীবনে মাথার উপর না ছিল মুক্তির আকাশ, না ছিল অবকাশ। শুধু কাজ আর কাজ। সৌন্দর্য, শান্তি ও আনন্দের চরম অভাব সত্তা-চেতনায় সর্বনাশ ডেকে আনে। মনুষ্যত্বের এই চরম লাঞ্ছনা ও অপচয় মানবজাতির পক্ষে এক ভয়াবহ লোকসান। এমন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে রোবোটিক্স কর্পোরেশন থেকে অবিকল তার মতো দেখতে আর একটি যন্ত্র-মানব নিয়ে এসে তার হয়ে প্রক্সি দিতে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির উদার প্রসন্নতায় মুক্তির খোঁজে–

> "আপনমনে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। কখনও নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখি।"[২১]

কিন্তু কিছুদিন পরেই যন্ত্রমানব রোবটটিও নির্দিষ্ট কক্ষপথের বিরামহীন কর্মের একঘেয়ে টানাপোড়েনে ক্লান্ত বিধ্বস্ত হ্যে ভোরবেলায় একটা পার্কের সামনে এসে কথককে জানায়–

> "বিশ্বাস করো, এরকম যান্ত্রিক জীবন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছে।"[২২]

শুধু তাই নয়—

> "এক একদিন তীব্র ক্ষোভে বলে ওঠে আমি সুইসাইড করবো।"[২৩]

আজকের সময়ে মনুষ্য সমাজের যাপিত জীবন কী পরিমাণ যান্ত্রিক ও বিষণ্ণতায় ভরা যেখানে যন্ত্রও ঐ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না। মানব সভ্যতার পক্ষে এ এক অগ্নিসংকেত। একদিন সেই রোবটও 'রোবোটিক্স ক্রপোরেশ্ন' থেকে ঠিক তার মতো দেখতে আর এক রোবটকে তার হয়ে প্রক্সি দেবার কাজে জুড়ে দিয়ে মুক্তির আনন্দের খবর দিতে নদীর ধারে কথকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে তখন কথক চরিত্রটিও জানতে পারে সেও আসলে রক্ত মাংস হাড় মেদ

মজ্জা মন ও আত্মাসহ গোটামানুষ নয়, রোবট। এরপর উভয়ের কথোপকথন গল্পের মর্মকথা প্রবন্ধের শীরোনামকে স্পর্শ করে–

> "রোবট বলল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি জবাব দিলাম, কাঁদছি সেই মানুষটার জন্যে। সে তা হলে কী কষ্টেই না ছিল বল তো।"[২৪]

তারপর সেদিন দুজনেই নদীর ধারে অস্তায়মান সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মর্মদ্রাবী হাহাকারে অনেকক্ষণ কেঁদেছে কারণ এটাই—

> "আমি আমরা তা হলে নিছকই অকিঞ্চিতকর নকল মানুষ। নিজেদের ঘৃণা করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই। হা ঈশ্বর!"[২৫]

আসলে আজকের সময়ে আমরা তো এক একজন প্রত্যেকে সত্তাশূন্য যন্ত্রমানুষেই পরিণত হতে বসেছি। মনুষ্যত্বের এই চরম লাঞ্ছনার বিপরীতে মানবমুখী ভাবনায় সম্পৃক্ত জীবনভাষ্য শোনাতে চেয়েছেন লেখক।

যন্ত্র সর্বস্ব সভ্যতা ও পণ্যায়নের যুক্তি শৃঙখলায় মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও একাকী হয়ে পড়ছে। বিশ্বের সমস্ত ভোগ্যপণ্যের মালিকানার লোভে সামাজিক ও পারবারিক দায়-দায়িত্ব ভুলে নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে একাকীত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ জীবন বেছে নিচ্ছে অনেকেই। যার থেকে জন্ম নিচ্ছে পারক্যবোধ, আবার অনেকের সাজানো সুখের সংসার ভেঙে শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। বিলাস- বৈভবের প্রাচুর্যতায় বিশুদ্ধ আনন্দ জীবন থেকে মুছে যেতে বসেছে। সঙ্গী শুধু নৈরাশ্যময় জীবনে অন্তহীন অবসাদ। 'ভালোবাসা ফুরিয়ে গেলে' গল্পের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আধুনিক সভ্যতার পদস্খলনে মানব ভাগ্যের পরিহাস। আর্ত মানুষের আখ্যান। সুখী গৃহকোণের সন্ধানে শহরের অভিজাত এলাকায় চোখধাধানো ফ্ল্যাটে স্ত্রী রত্নমঞ্জুষাকে নিয়ে স্বর্ণ দ্যুতি কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে সংসার বাঁধে পঁচিশ বছর আগে। এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে আনন্দের পরিপূর্ণ জীবন। কিন্তু দিন যত গড়িয়েছে ফিকে হয়ে পড়েছে সম্পর্কের রং শীতল হয়েছে সম্পর্কের উষ্ণতা। জীবনের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙক্ষার আত্মসুখে সকলেই মগ্ন । স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার বিপ্রতীপে বাস করে। এক ভয়াল ভালোবাসাহীনতা আজকের মানুষের জাগতিক অস্তিত্বকে ব্যথিত করে তুলছে। স্বর্ণদ্যুতির ভাষায়—

> "আমাদের মধ্যে রিলেশনটা এখন সেই জায়গায় পৌঁছে গেছে। আমরা যেন এক-একটা ফ্ল্যাট। পাশাপাশি আছি অথচ মাঝে মরুভূমির মতো বিস্তর ফাঁক। মানে, ধরো একটা মুক্তোর মালা– কিন্তু পাশাপাশি বসানো পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে যে সুতোটা যায়, সেটাই নেই। বাইরে থেকে দেখে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না। মনে হবে মুক্তোর মালাটা ঠিকঠাকই আছে। তাই আমরা এখন ফ্ল্যাট– নাকি ত্রিশঙ্কু মুক্তো? কে জানে!"[২৬]

একাকীত্বের এই গহন বিষাদে কান্নায় ভেঙে পরে স্বর্ণদ্যুতি –

> "আচমকা হাটুগেড়ে বসে পড়ল স্নিগ্ধপ্রভাতের পায়ের কাছে। ওর কোলে মাথা রেখে কান্না জড়ানো গলায় বলতে লাগল, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে রে, সব ভালোবাসা ফুরিয়ে গেছে।"[২৭]

একাকীত্বের গূঢ় অন্তরদহনে স্নিগ্ধপ্রভাত ও সুপর্ণলতিকা দাম্পত্য সম্পর্কও আজ প্রশ্নের মুখে। ভালোবাসা ফুরিয়ে যাওয়ায় একদা প্রিয় মানুষ দুটো আজ স্বতন্ত্র দ্বীপের অধিবাসী। আড়াই বছরের মধ্যে তাদের দাম্পত্যের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেছে—

> "এখন ওর মনে হয় ধীরে ধীরে ও আর সুপর্ণলতিকা দুটো ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। রাতে সেই দুটো ফ্ল্যাট পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকে।"[২৮]

পারাপারহীন নীরব বিচ্ছিন্নতাবো্ধ মৃত্যুর শীতলতা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে থাকে। সমগ্র বিশ্বে এই ব্যাধি মহামারির আকার নিয়েছে। লক্ষ্যণীয় গল্পে ডিভোর্স শব্দের একাধিকবার ব্যবহার। কিন্তু সংকট বা বিপন্নতায় নয়, গল্পের শেষে নিভে যাওয়া সম্পর্কের উষ্ণতা বহমান রাখতে লেখক বৈজ্ঞানিক-কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ডাঃ নীতিনপ্রকাশ এম এম টেকনোলজি অর্থাৎ মেমোরি ম্যাপিং টেকনোলজি দিয়ে স্নিগ্ধপ্রভাতের মেমোরিতে সুপর্ণলতিকা্র চেহারা ও আচরণের

যে স্মৃতি ছিল সেটা টোটাল মুছে দিয়ে পছন্দ মতো মেমোরি স্থাপন করে দেওয়াতে পাল্টে যায় তার স্বভাব চরিত্র। আবার নতুন করে স্বপ্ন নির্মাণের আকুলতায় উদ্বেলিত হয় ভালোবাসায় টইটুম্বর দম্পতি। ডাক্তার প্রতিশ্রুতি দেন—

> "সমাজের যে কোনও স্বামী-স্ত্রীর প্রবলেম শলভ করার জন্য আমি এবং আমার এম এম টেকনোলজি সবসময় হাজির।"[২৯]

'সুখের সংসার ডট কম' গল্প মানুষের সংকটের আর এক করুণ ছবি। সংসারের সকল সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতার উচ্ছলতা, যৌথ আবেগ মমতা বিশ্বাস ও ভালবাসায় গড়ে ওঠে ভালো বাসা। সংসার সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে পরিবারের সদস্যরা জীবনযুদ্ধের সাপ লুডো খেলাতে যত মত্ত হয়েছে সংসারে সুখ নামক অনুভূতিটি ক্রমশঃ অপসৃত হতে বসেছে। তাই সুখ এখন ডব্লু ডব্লু ডট কম নামক বায়ু-তরঙ্গেই উপভোগ করতে হয়। লাবণ্যদেবী তার স্বামীকে হারিয়ে পুত্র পুত্রবধূ কন্যা জামাতা নাতি নাতিনীদেরকে নিয়ে নির্ভরতায় পরিপূর্ণ সংসারিক জীবনের সুখ–স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। এ কোনো অলৌকিক প্রত্যাশা নয়, কারণ মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি আস্থাতেই তো গভীর সুখ। কিন্তু পুত্র পুত্রবধূ কন্যা জামাতা এবং দুই নাতি– এত আত্মীয় থেকেও লাবণ্য দেবীর পৃথিবী বড় শূন্য–

> "বিয়ের পর পরই দীপ্তিমান আলাদা হয়ে গেছে। তার দু বছরের মধ্যেই চলে গেছে আমেরিকায় - প্রথম প্রথম দু-চারবার ফোন-টোন করেছিল। তারপর - তারপর সব শেষ। অনুরিতা বালিগঞ্জে থাকলেও ব্যাপারটা আমেরিকার মতন। একটা দিন ও খোঁজ নেয় না, মা কেমন আছে। মাস দুয়েক আগে একবার ফোন করে জানতে চেয়েছিল টাকার দরকার আছে কি না।"[৩০]

সকলেই কেমন ব্যক্তিগত সুখকেন্দ্রিক আচ্ছন্নতায় মগ্ন হয়ে ক্রমাগত ভালোবাসা-স্নেহ-স্পর্শ শূণ্য জীবনে অবনমিত হচ্ছি। মানব জীবনের পক্ষে এ এক মর্মন্তুদ পরিণতি। তাই এই সংকট থেকে মুক্তি দিতে লেখকের এই গল্প ব্যাঙ্গের চাবুক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পে বর্ণিত লাবণ্য দেবীর সংসারে যে এত সুখ তা আসলে নকল। পরিবারের এই মানুষগুলোর ফটোগ্রাফ দেখিয়ে চেহারায় মানুষের মতো কথা বলা রোবটগুলো লাবণ্য দেবী তৈরি করেছেন কম্পুটার কোম্পানীকে। তারা লাবণ্যদেবীর পছন্দই সফটোয়্যার ঢুকিয়ে দিয়েছে এই অ্যানড্রয়েডগুলোর ভেতরে। ফলে সারাটাদিন এই নকল মানুষগুলো পোগ্রাম অনুয়ায়ী কথা বলে, হাঁটাচলা করে। এই রোবটগুলোর ভেতরে সপ্তাহের সাতটা দিনের জন্য সাত রকম পোগ্রাম ভরা আছে।"[৩১] আসলে সমসময়ের দর্শনে মানবিক ব্যর্থতাকে প্রশমিত করতে আমরা বিকল্প হিসাবে অর্থহীন অসম্ভব যান্ত্রিকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি, যা কখনোই মানুষকে ঐশ্বর্যবান করতে পারে না। তাই গল্পের শেষে দেখা গেছে—

> "আলো নেভানোর সময় প্রমথনাথের ছবির দিকে চোখ গেল। ছবি থেকে লাবণ্যর মৃত স্বামী চাপা গলায় জিগ্যেস করল, বউ কেমন আছ? লাবণ্যর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। অতি কষ্টে চোখের জল রুখে দিয়ে ফিসফিস করে করে বললেন, ভালো আছি-সুখের সংসার নিয়ে দারুণ আছি। তারপর সুইচ টিপে অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।"[৩২]

এ অন্ধকার লাবণ্যদেবীর বাইরের অন্ধকার নয়, প্রাণের প্রবাহ বর্জিত কাছের মানুষগুলোর মানবিক অধঃপতন জনিত অন্ধকার। এই আগ্রাসী অন্ধকারে শুধু লাবণ্যদেবী একা নন গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হতে বসেছে। যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা যদি মানুষের সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে তবে তা একপ্রকার আত্মহনন। এমন দিন যেন না আসে মানুষের ইতিহাসে।

বিজ্ঞান আজকের এই জড়বাদী সভ্যতার যতই নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠুক না কেন, জীবন দর্শন, সুচেতনা ও শ্রেয়নীতি ছাড়া সুসভ্য সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। অতিরিক্ত যান্ত্রিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে আঘাত করে, তার স্বীকৃতিকে ছোটো করে জড় মানুষে পরিণত করে। লেখক অনীশদেবের দ্রষ্টা চক্ষু জীবনের স্বাভাবিক লক্ষণের উল্টো দিকে বয়ে চলা অন্ধকারের মধ্যে মানবিক আলোর উদ্ভাসন ঘটিয়ে মানবিক মহত্ত্বের ব্রত উদযাপন করেছেন। লেখক আশাবাদী শুভবুদ্ধির উদয়ে মানুষের তৈরি আঁধার মানুষের তপস্যাতেই আলোকিত হবে।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ১৪০
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ১২১
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ছোটগল্পের বিনির্মাণ, অঞ্জলি পাবলিশার্স, পৃ. ১১৮
৪. দেব, অনীশ, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, পত্রভারতী, পৃ. ৬২
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. তদেব, পৃ. ৬৫
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃ. ৪০০
৮. দেব, অনীশ, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, পত্রভারতী, পৃ. ১০০
৯. তদেব, পৃ. ১০৩
১০. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, (সম্পাদিত), ২৫টি রোমাঞ্চকর কল্পবিজ্ঞান, পারুল, পৃ. ১৯০
১১. তদেব, পৃ. ১৯২
১২. তদেব, পৃ. ১৯৫
১৩. তদেব, পৃ. ১৯৬
১৪. তদেব, পৃ. ১৯৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৯৮
১৬. দেব, অনীশ, (সম্পাদিত), সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ৩১৫-৩১৬
১৭. তদেব, পৃ. ৩২১
১৮. তদেব, পৃ. ৩২৬
১৯. তদেব, পৃ. ৩২৬
২০. তদেব, পৃ. ৩২৮
২১. দেব, অনীশ, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, পত্রভারতী, পৃ. ২২৩
২২. তদেব, পৃ. ২২৪
২৩. তদেব, পৃ. ২২৪
২৪. তদেব, পৃ. ২২৬
২৫. তদেব, পৃ. ২২৬
২৬. তদেব, পৃ. ২০৬
২৭. তদেব, পৃ. ২০৬
২৮. তদেব, পৃ. ২০৭
২৯. তদেব, পৃ. ২১৮
৩০. তদেব, পৃ. ১৫৪
৩১. তদেব, পৃ. ১৫৩
৩২. তদেব, পৃ. ১৫৪